কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 2 ... 2017 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিম্নমানের কাগজে বিনা মূল্যের বই!

- কালো তালিকাভুক্ত প্রেসও নাম বদল করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে
- নভেম্বর-ডিসেম্বরে তাড়াহুড়া করে আরো নিম্নমানের বই ছাপার প্রস্তুতি

শরীফুল আলম সুমন ▷

নিম্নমানের কাগজ, ছাপা ও কালি ব্যবহার করার অভিযোগে ২০১৫ সালে লামিয়া প্রেসকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। মালিক মো. জসিম ২০১৬ সালে ওই প্রেসের নাম পাল্টে রাখেন প্লাসিড প্রেস। নতুন নাম দিয়ে বিনা মূল্যের পাঠ্য বই ছাপার কাজ পায় ওই প্রতিষ্ঠান। ওই বছরও নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই সরবরাহ করতে না

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

নিম্নমানের কাগজে বিনা মূল্যের বই!

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারায় প্রতিষ্ঠানকে পরের বছর কাজ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এনসিটিবি। কিন্তু এবার ভাগ্নের নামে ওই একই প্রেস রেজা প্রিন্টার্স নাম দিয়ে দিব্যি বিনা মূল্যের বই ছাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে ২০১৫ সালে কালো তালিকাভুক্ত করা দেওয়ান প্রিন্টার্স এবার রনি প্রিন্টার্স নামে বিনা মূল্যের বই ছাপার কাজ করছে। টাঙ্গাইল প্রিন্টার্স, খান প্রিন্টার্স, মডেল প্রিন্টিং প্রেসসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নাম বদল করে এনসিটিবির নিয়মের ফাঁক গলে একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিম্নমানের কাগজে ছাপছে বিনা মূল্যের বই।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিনা মূল্যের বই ছাপায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। মাধ্যমিকের বই ছাপার কাজ ইন্সপেকশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্ট বালটিক বিডি লিমিটেড সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এনসিটিবিকে জানিয়েছে, ৩২টি প্রেসের নিজস্ব ছাপাখানা ও বাঁধাইখানা নেই। তারা নিম্নমানের কাগজে বই ছাপছে। এর পরও ওই সব প্রেসের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এনসিটিবি। উল্টো গত সোমবার এসবের মধ্যে ১৫টির মতো প্রতিষ্ঠানকে সুখপাঠ্য করা প্রায় দুই কোটি বইয়ের বেশির ভাগ ছাপার কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। ঝুঁকির তালিকায় থাকা মহানগর প্রিন্টিং প্রেস, ফাইভ স্টার প্রিন্টিং প্রেস, পিএ প্রিন্টার্স, ফেইথ প্রিন্টিং প্রেস, দিগন্ত অফসেট প্রিন্টার্স, বৃষ্টি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্সসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সুখপাঠ্য করা বইয়ের কাজ পাওয়ায় সময়মতো বই সরবরাহ করা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে আবার একই প্রেসের নাম বদল করেও সুখপাঠ্যের কাজ পেয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর সুখপাঠ্য করা বইয়ের কার্যাদেশ দেওয়া শুরু হয়েছে। নিয়মানুযায়ী কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠান সাত দিনের মধ্যে সম্মতিপত্র দেবে। এর পর থেকে ২১ দিনের মধ্যে চুক্তি করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কাজ শেষ করার জন্য ৫৫ দিন সময় পাবে। ফলে হিসাব অনুযায়ী ১৩ জানুয়ারি কাজ শেষ হবে প্রায় দুই কোটি পাঠ্য বইয়ের। ফলে বছরের প্রথম দিন শিশুদের হাতে সব বই তুলে দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা শতভাগ আশাবাদী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব পাঠ্য বই পৌঁছে যাবে। পাশাপাশি আমরা মানের ব্যাপারেও কঠোর। নিম্নমানের কাগজ, কালি যাতে ব্যবহার করা না হয় সে জন্য আমাদের পরিদর্শনদল তদারকি করছে। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। তবে কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কিছু ছোট প্রেসও কাজ করছে, যাদের ব্যাপারে মাঝেমধ্যে অভিযোগ আসে। আমরা আস্তে আস্তে এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। কালো তালিকাভুক্ত কোনো প্রেস যাতে ভিন্ন নামেও আগামী দিনে দরপত্রে অংশ নিতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, কয়েকটি পেপার মিলস ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সিন্ডিকেট করে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এনসিটিবি। কাউকে কাউকে কেবল শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এনসিটিবির কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে কিছু মুদ্রণপ্রতিষ্ঠান নিম্নমানের কাজের একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। এতে এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তাও জড়িত। এই সিন্ডিকেট সরকারের মহৎ অর্জনকে নস্যাৎ করার চেষ্টায় লিপ্ত। এ ছাড়া কিছু মুদ্রণপ্রতিষ্ঠান নিম্নমানের কাগজ কিনে গুদামজাত করেছে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে বই সরবরাহের চাপ থাকায় তখন এসব কাগজ দিয়ে ছাপানো শুরু করবে তারা, যাতে মানের দিকে কেউ নজর দিতে না পারে। এমনকি মাধ্যমিক ও প্রাথমিকের দুই ইন্সপেকশন এজেন্টকেও ম্যানেজ করার পাঁয়তারা চলছে।

মাধ্যমিকের ইন্সপেকশন এজেন্ট বালটিক বিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আর কাইয়ুম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা প্রতিনিয়তই পরিদর্শনে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যা পাচ্ছি। তবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় নিম্নমানের কাগজ। আমরা যা পাই তা এনসিটিবিকে লিখিতভাবে জানাই। ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব তাদেরই।'

আগাম তথ্যের ভিত্তিতে গত ২১ অক্টোবর এনসিটিবির চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন কর্মকর্তা গেণ্ডারিয়ার ৪৩ এস কে দাস রোডে দ্য ক্যাপিটাল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স পরিদর্শনে যান। তাঁরা গিয়ে দেখতে পান, ৪০০ থেকে ৫০০ বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা আছে। এতে মনে হয় কাজ চলছে; কিন্তু বইয়ের একটি বান্ডিল খুলে দেখা গেল, মুদ্রণকারীর নামের জায়গায় রয়েছে ৩ নম্বর কাজী জিয়াউদ্দিন রোডের শম্পা প্রেসের নাম। পরে জানা যায় তারা এক লাখ ৭৫ হাজার ৮০০টি বই মুদ্রণের কাজ পেলেও এখনো একটিও ছাপায়নি। অথচ তাদের ১৪ নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা। এ ছাড়া সূত্রাপুরের ৩৪ আর এম দাস রোডে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের নিজস্ব প্রেস নেই। পরিদর্শনদল গেলে সবাই একই মেশিন দেখায়। এসব প্রেস অনেক আগে কাজ পেলেও একেবারে শেষ সময়ে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপে। ওই সব ছয় মাসও পড়তে পারে না শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি ৪২ লাখ। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১৫ কোটি বইয়ের জন্য কাগজ সরবরাহ করে এনসিটিবি। দরপত্রের মাধ্যমে ওই কাগজ কেনে এনসিটিবি। ওই কাগজের মান দরপত্রে নির্ধারিত মানের চেয়েও উন্নত। বাকি ২০ কোটি বইয়ের মধ্যে অনেক কাজেই নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করা হয়। এমনকি অনেক প্রেসকে এনসিটিবি তাদের কেনা মানসম্পন্ন কাগজ সরবরাহ করলেও সেটা তারা বিক্রি করে নিম্নমানের কাগজ কিনে বই মুদ্রণের কাজ করে।

এনসিটিবির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, 'এবার মাধ্যমিকের বইয়ের জন্য ৬০ জিএসএমের কাগজ কিনেছি। কিন্তু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিশ্রুতির চেয়েও ভালো ৬৩ জিএসএমের কাগজ সরবরাহ করেছে। এর মূল্য টনপ্রতি ৭৩ হাজার টাকা। কিছু মুদ্রণকারী এই কাগজ বিক্রি করে ৫০ জিএসএমের কাগজ ৫৩ হাজার টাকা দরে কিনে বই ছাপছে। এ ছাড়া আমরা ২৩০ জিএসএমের আর্ট পেপার সরবরাহ করলেও তা বিক্রি করে ১২০ জিএসএমের পেপার ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

সম্প্রতি একটি বড় মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ৫৫ জিএসএমের কাগজে বই ছাপতে শুরু করে। এনসিটিবির একটি পরিদর্শনদল ওই অনিয়ম দেখতে পায়। পরে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মতিতে ছাপিয়ে ফেলা ২৫ হাজারেরও বেশি বই কেটে ফেলে পরিদর্শনদল। কিন্তু বাস্তবে নিম্নমানের কাগজে ছাপা বইয়ের সংখ্যা আরো বেশি বলে জানা যায়। অপর প্রতিষ্ঠান পিএ প্রিন্টার্স কাগজের ছাড়পত্র না নিয়েই প্রায় তিন লাখ বই ছেপে ফেলেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানই নিম্নমানের কাগজে বই ছেপে যাচ্ছে।

জানা যায়, বাজারে নিম্নমানের কাগজ সরবরাহ করার শীর্ষে আছে আল নূর পেপার মিলস। এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আগের বছরগুলোতেও নিম্নমানের কাগজ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এনসিটিবিতে। এ ছাড়া মক্কা পেপার মিলস, গাজীপুর পেপার মিলস, পূর্বাচল পেপার মিলস, হাক্কানী পেপার মিলস, মোস্তফা এবং ইকো পেপার মিলস নিম্নমানের কাগজ সরবরাহ করছে। এসব পেপার মিলস বইয়ের কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের কাছে বাজারদরের চেয়ে ৮-১০ হাজার টাকা কমে খুবই নিম্নমানের কাগজ দিচ্ছে। মূলত এসব নিউজপ্রিন্ট। এসব পেপার মিলের অনেকেই সাধারণত নষ্ট কাগজ রিসাইক্লিং করে আবার কাগজ উৎপাদন করে। আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের যেসব বইয়ের কাগজ ৮০ জিএসএম থাকার কথা, সেখানে ৬০ থেকে ৬৫ জিএসএমের কাগজ কম টাকায় সরবরাহ করছে এসব মিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মানহীন কাগজে বই ছাপছে। বাঁধাইয়ে উন্নতমানের গ্লু ব্যবহার করার কথা থাকলেও করা হচ্ছে সাধারণ আঠা। তাদের মুদ্রণও ভালো নয়। যাদের বিরুদ্ধে ইন্সপেকশন এজেন্ট অভিযোগ দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে প্রিয় প্রিন্টিং প্রেস, এসআর প্রিন্টিং প্রেস, মডেল প্রিন্টিং প্রেস, লিখন প্রিন্টিং, সীমান্ত প্রিন্টার্স, কোয়ালিটি প্রিন্টিং প্রেস, রেজা প্রিন্টিং প্রেস, পিএ প্রিন্টার্স, রিফাত প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, বর্ণমালা প্রেস, নুরুল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, ফাহিম প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, মেসার্স সোম প্রিন্টিং প্রেসসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। এরা নিম্নমানের কাগজ, কালি ব্যবহার করছে। তাদের কাজ যথাসময়ে শেষ করা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এরই মধ্যে ৫৩ থেকে ৫৪ শতাংশ বই পৌঁছে গেছে। নিম্নমানের কাজ যাতে কেউ করতে না পারে সে জন্য আমরা সপ্তাহের ছয় দিনই পরিদর্শনকাজ চালু রেখেছি। এর পরও যদি নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করা বই পাওয়া যায়, তাহলে সেসব আমরা কেটে ফেলছি। শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে মানসম্পন্ন বই তুলে দিতে আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

জানা যায়, সম্প্রতি মানিকগঞ্জের এসআর প্রিন্টার্সের নিম্নমানের ৬০ টন কাগজ আটকে দিয়েছে প্রাথমিকের ইন্সপেকশন এজেন্ট কন্টিনেন্টাল বিডি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব নিম্নমানের কাগজ প্রেস থেকে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হলে ওই প্রেস সেই কাগজ সরিয়ে নেয়। এ ছাড়া নিম্নমানের কাগজ দিয়ে বই ছাপার সময় একটি বড় প্রতিষ্ঠানেরও কাগজ আটকে দেয় কন্টিনেন্টাল বিডি। তবে তাদের এখনো কাগজ সরানোর কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি। আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের কাগজ গুদামজাত করছে। নভেম্বরের শেষ দিকে বই ছাপার চাপ বাড়তে থাকলে তখন এসব কাগজ দিয়ে ছাপা শুরু করবে তারা। অভিযোগ রয়েছে, কয়েক বছর ধরে ছোট-বড় একাধিক প্রতিষ্ঠান বছরের শেষ দিকে নিম্নমানের কাগজে বই ছাপায়। এমন অভিযোগে বেশ কয়েকবার এসব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা ও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথ নজরদারি না থাকায় তারা থেমে নেই।

বিশেষজ্ঞরা জানান, নিম্নমানের কাগজে বই ছাপানো হলে ছাপার মান অনেক খারাপ হয়। কোনো কোনো ছবি থেকে কালি উঠে যায়। ছবি বোঝা যায় না। নিম্নমানের পেপার মিলের কাগজে বেশ কিছু উপাদান ব্যবহার না করায় দুর্গন্ধসহ নানা ধরনের জীবাণু থেকে যায়। আর শিশুরা মুখের থুতু ব্যবহার করে পাতা ওল্টানোয় এসব বই শিশুস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।